অনুচ্ছেদ কি? অনুচ্ছেদ লেখার পদ্ধতি বা নিয়ম? অনুচ্ছেদ লেখার প্রয়োজনীয়তা

অনুচ্ছেদ রচনা :
কোনো বিষয়ে কয়েকটি বাক্যে লিখে যখন একটা বিশেষ ভাবকে সহজভাবে প্রকাশ করা হয় , তাকে অনুচ্ছেদ বলে ।

প্রয়োজনীয়তাঃ

কয়েকটি অর্থযুক্ত শব্দ একের পর এক সাজিয়ে বাক্য তৈরি হয় । বাক্যের সাহায্যে আমরা মনোভাব প্রকাশ করি । কিন্তু , একটিমাত্র বাক্যে মনেরভাব কখনোই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না । তখন মনোভাব প্রকাশের জন্য আমাদের একাধিক বাক্যের আশ্রয় নিতে হয় । কতগুলো বাক্যের মাধ্যমেই ভাবটি সম্পূর্ণরুপে প্রকাশ করা যায় ।

অনুচ্ছেদ রচনার পদ্ধতি :

অনুচ্ছেদ রচনার সময় কয়েকটি বিষয় আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।
নিচে তা আলোচনা করা হলো :

(১) কোনো অনুচ্ছেদ লেখার আগে ওই অনুচ্ছেদের বিষয় সম্পর্কে ভালো করে চিন্তা করে কী কী ভাব প্রকাশ করতে হবে তা মনে মনে সাজিয়ে নিতে হবে।

(২) অনুচ্ছেদ সাধারণত অল্পসংখ্যক বাক্যে লেখা হয়। তাই অনুচ্ছেদে বাক্যগুলোর মধ্যে ভাবের সংগতি বজায় রাখতে হবে। অনুচ্ছেদের ভাষা হবে সহজ - সরল এবং বক্তব্য হবে স্পষ্ট।

(৩) একই বাক্য বা শব্দ যাতে বার বার ব্যবহৃত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(৪) সাধু অথবা চলিত যেকোনো একটি রীতিতে অনুচ্ছেদটি লিখতে হবে। বানান ও ব্যাকরণগত দিক থেকে অনুচ্ছেদটি নির্ভুল রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

(৫) রচনায় সরসতার ভাব আনার চেষ্টা করতে হবে।

(৬) অনুচ্ছেদের বাক্যগুলো ভাব পরম্পরায় ক্রমশ একটি সিদ্ধান্ত বা উপসংহারের দিকে এগিয়ে যাবে। প্রথম ও শেষ বাক্য যেন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

অনুচ্ছেদ রচনা :

প্রশ্ন ঃ অনুচ্ছেদকে ইংরাজিতে কী বলে ?

উঃ ইংরাজিতে যাকে Paragraph বলে বাংলায় তাকে বলে 'অনুচ্ছেদ'।

প্রশ্ন ঃ অনুচ্ছেদ কী ?

উঃ কোন একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যে রচনা তার একক একটি অংশই হল অনুচ্ছেদ।

প্রশ্ন ঃ অনুচ্ছেদ রচনায় যেসব বিষয়ে লক্ষ রাখা হয় তার মধ্যে দুটি উল্লেখ করো।

উঃ ১. বিষয় অনুযায়ী একটি শিরোনাম ব্যবহার করতে হবে।

২. বক্তব্য বিষয় থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য বিষয় যেন তার মধ্যে না আসে।

প্রশ্ন ঃ অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধের পার্থক্য কোথায় ?

উঃ একটি প্রবন্ধ অনেকগুলি অনুচ্ছেদের সমবায়ে গঠিত আর অনুচ্ছেদ হল কতগুলি বাক্যের সমবায়ে গঠিত।

প্রবন্ধের আয়তন বেশি এবং অনুচ্ছেদের আয়তন কম।

প্রশ্ন ঃ অনুচ্ছেদের ভাষা কেমন ?

উঃ অনুচ্ছেদের ভাষা হবে একমুখী, সহজ সরল। সঙ্গে থাকবে যুক্তি তর্কের সমাবেশ।

গ. অনুচ্ছেদ রচনা

ইংরাজিতে যাকে Paragraph বলে বাংলায় তাকে বলে 'অনুচ্ছেদ'। কোন একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যে রচনা তার একক একটি অংশই হল অনুচ্ছেদ। অর্থাৎ কতকগুলি অনুচ্ছেদের সমবায়েই একটি প্রবন্ধ, রচনা বা গল্প ইত্যাদি রচিত হয়। একাধিক বাক্যের সমন্বয়ে অনুচ্ছেদ রচিত হয়। অনুচ্ছেদ রচনার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর লেখনী দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক তথ্য জ্ঞান বাড়ে। অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্ন-উত্তর লেখার ক্ষেত্রেও ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়েই মূলত অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়। অনুচ্ছেদ রচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি লক্ষ রাখতে হবে –

১. বিষয় অনুযায়ী একটি শিরোনাম ব্যবহার করতে হবে।
২. বক্তব্য বিষয় থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য বিষয় যেন তার মধ্যে না আসে।
৩. রচনার শুরুতে কিছুটা অংশ ছেড়ে লেখা শুরু করতে হয়।
৪. অনুচ্ছেদের বক্তব্য বিষয় হবে সর্বদা একমুখী।
৫. অনুচ্ছেদের মধ্যে যুক্তি তর্ক থাকলে বক্তব্য প্রতিষ্ঠা পায়।
৬. অনুচ্ছেদের আয়তন যেমন খুব ছোটো হবে না তেমনি আয়তন খুব বড়ো হবে না। কমবেশি ১৫০ টি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই ভালো। তবে বক্তব্য বিষয় অনুযায়ী শব্দের সংখ্যা কম বেশি হতেই পারে।
৭. খুব সহজ, সরল, স্বচ্ছ ভাষাকে অনুচ্ছেদে ব্যবহার করতে হবে। অতিরিক্ত সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার না করাই ভালো।
৮. একই কথার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বিদ্যাসাগর

মানুষ যখন সংস্কারে আচ্ছন্ন তখনই বিদ্যাসাগরকে বেশি করে জানা প্রয়োজন। মূল্যবোধ জাগরনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আমরা যাঁরা বাংলা ভাষী, তাঁদের প্রত্যেকের শিক্ষাগুরি বিদ্যাসাগর। কিন্তু তাঁর জন্ম (১২ আশ্বিন, ১২২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার)-এর দুশোবছর চলে এলে তিনি যা দিয়েছেন, তার কিছুটা ঋণ আজও আমরা যথাযথ শোধ করতে পারিনি। বাঙালির সত্তা মানেই বিদ্যাসাগর। মধুসূদন 'বঙ্গাকূলচূড়া' আর রবীন্দ্রমূল্যায়নে 'বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী'। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ রোধে, বিধবা-বিবাহ প্রচলনে তাঁকে ঘরে-বাইরে কম লড়াই করতে হয়নি। বীরসিংহ থেকে কোলকাতা; কোলকাতা থেকে বর্ধমান; বর্ধমান থেকে কার্মাটাড় -- আমৃত্যু মানুষের জন্য তাঁর পদযাত্রা। শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং কুসংস্কারের পরিবর্তন যাত্রা তাঁকে ক্ষণকাল স্থির থাকতে

দেয়নি। এমন মানবপ্রেমী, সমাজসেবী, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ্, শাস্ত্রজ্ঞানী, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ পাওয়া দায়। পিতা ছিলেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর মাতা ভগবতী দেবী। তাঁর জীবনের পিতার তুলনায় মাতার প্রভাবই বেশি। বীরসিংহ গ্রামে অবস্থান এবং কালীকান্তের পাঠশালায় অধ্যায়ন করেছিলেন। ইংরাজি শেখার জন্য পিতার সঙ্গে কলকাতায় আগমন। কোলকাতায় সংস্কৃত কলেজে বার্ষিক পরীক্ষায় অর্থাৎ সাহিত্য শ্রেণির দ্বিতীয় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম হলেন। পুরস্কার পেলেন 'সাহিত্য দর্পণ', 'কাব্যপ্রকাশ' এবং দুই খণ্ডে 'হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'। 'হিন্দু-ল' পরীক্ষা ও প্রশংসাপত্র লাভ করলেন। হিন্দু-ল কমিটি অব এক্সামিনেসনের সার্টিফিকেটে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করলেন । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন। বেথুন নারী বিদ্যালয়ে অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য অধ্যাপকে পদে যোগ দেন। বিদাসাগর শিক্ষা বিস্তার ছাড়াও নানা সমাজ সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বহুবিবাহ রহিত করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। বর্ধমানের রাজাসহ বিশিষ্ট জনেরা তাঁকে সমর্থন করেন। ১৮৫৬ বিধবাবিবাহচালু হয়।

দেশনায়ক মহাত্মা গান্ধী

একথা বহুল প্রচলিত যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে 'মহাত্মা' উপাধি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। আর মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। এই তথ্য সুধীর চক্রবর্তী সংশোধন করে বলেছেন যে, আফ্রিকায় থাকাকালীন 'গোন্ডাল রসশালা' নামক আয়ুর্বেদিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জয়রাম শাস্ত্রী প্রথম গান্ধীকে 'মহাত্মা' আখ্যা দিয়েছিলেন। আর শান্তিনিকেতনের আদিপর্বের শিক্ষক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রথম রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে ডেকেছিলেন। সে যাইহোক গান্ধীজী ছিলেন 'ভারতের বাণীমূর্তি আর রবীন্দ্রনাথ হলেন 'ভারত আত্মা'। গুজরাটের পোরবন্দরে ২ অক্টোবর, ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজীর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন করমচাঁদ উত্তমচাঁদ গান্ধী, মাতা ছিলেন পুতলীবাঈ। পূর্বপুরুষের মুদির ব্যবসা, পিতা পোরবন্দরে দেওয়ানি করতেন। বংশ পরম্পরা তিনি সত্যনিষ্ঠা, ধর্মপ্রাণতা, ক্ষমা-করুণা-সহিষ্ণুতার অধিকারী হয়েছিলেন। গান্ধীজী অহিংসার পূজারি ছিলেন। ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য কংগ্রেসের পতাকাতলে যোগদেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনিই প্রথম সর্বভারতীয় একক নেতৃত্বে পরিণত হন। ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীদের উপর অত্যাচার ক্রমশ বাড়িয়ে তোলায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। পরবর্তীকালে তাঁর আইন অমান্য আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ডান্ডি অভিযান, গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলন ইত্যাদি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে। জাতির উদ্দেশ্যে এই সময় গান্ধীজীর বাণী ছিল— 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষের কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বসু

বিদেশ থেকে বিজ্ঞান চর্চার পাঠ নিয়েও যাঁরা ভারতবর্ষ তথা মাতৃভূমিতে সারাজীবন বিজ্ঞান চর্চা করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন জগদীশচন্দ্র বসু। বাংলার বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে তাঁর বিবিধ অবদানগুলি হলো— পদার্থবিদ্যা নিয়ে বি.এ. পাশ করার পর বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে বি. এসসি পাশ করে ফেরেন। কারণ তাঁর আগ্রহের অন্যতম বিষয় ছিল পদার্থ বিজ্ঞান। তাঁর প্রথম গবেষণার বিষয় বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। যার সাহায্যে বিনা তারে তিনি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে সংকেত পাঠাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর এই আবিষ্কার বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সারা পড়ে এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি প্রদান করেছিল। প্যারিসের আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে 'জড় ও জীবের মধ্যে উত্তেজনা প্রসূত বৈদ্যুতিক সাড়ার সমতা' প্রবন্ধটি পাঠ করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণির পেশিতন্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন। মানুষের স্মৃতিশক্তির যান্ত্রিক মডেল, আধুনিক র‍্যাডার যন্ত্র, ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ে তিনিই পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর অন্যতম মৌলিক গবেষণা যা সারা পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছিল, তা হলো 'উদ্ভিদের চেতনা অনুভূতি'। এই সূত্রে প্রমাণ করেছিলেন উদ্ভিদও মানুষের মতো উত্তেজনায় সাড়া দেয়। তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব হলো ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' স্থাপন করা। এখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বেশ কিছু যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন করে 'অব্যক্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করেন।

সত্যজিৎ রায়

রায়চৌধুরী পরিবারের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা সত্যজিৎ রায়ের বাংলা চলচ্চিত্রে লিজেন্ড। তিনি একের পর এক কালজয়ী সিনেমা সৃষ্টি করে বাঙালি তথা বিশ্ববাসীর শিল্প মনকে তৃপ্ত করে গেছেন। ১৯৪৩-এ ডি. কে. গুপ্তের সিগনেট প্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিশুদের জন্য বিভূতিভূষণের 'আম আঁটির ভেঁপু'র ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি 'পথের পাঁচালী'-র দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। এই পর্বেই ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ চিদানন্দ গুপ্তসহ কয়েকজনের সহযোগিতায় 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি' গড়ে তোলেন। '৪৯-এ প্রখ্যাত পরিচালক জঁ রেনোয়ার 'দ্য রিভার'-এর শুটিং-এ কলকাতায় এসে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁকে 'পথের পাঁচালী' ছবির জন্য উৎসাহ দেন। এরপর বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজে ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় তিনি ইউরোপের বিখ্যাত সব সিনেমা দেখার সুযোগ পান। পরে দেশে ফিরে বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় 'পথের পাঁচালী' নির্মাণের কাজে হাত দেন। নানা-বিপত্তি অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৬-এ আগস্ট 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পায়। যা আন্তর্জাতিক মানচিত্রে ভারতীয় সিনেমাকে

চিরকালীন পরিচিতি দেন। কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই সিনেমা 'মানবতার শ্রেষ্ঠ দলিল' শিরোপা পায়। তাঁর হাতেই প্রথম সাহিত্যের চলচিত্রায়ণ ঘটে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ছাড়া তাঁর কাহিনি অবলম্বনে 'অপরাজিত' এবং 'অপুর সংসার' ছবি দুটিও চলচ্চিত্র জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। 'অপুর সংসার' ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস ছাড়া ছোটোগল্প 'তিন কন্যা', 'নস্টনীড়' (চারুলতা); প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী'; তারাশঙ্করের 'জলসাঘর'; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ইত্যাদির চলচ্চিত্রায়ণ তাঁর হাত ধরেই ঘটে। 'সোনার কেল্লা', 'হীরক রাজার দেশে', 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ও 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এর মতো শিশু-কিশোর মনের উপযোগী সিনেমা তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। এগুলি বড়োদেরকেও আকৃস্ট করে।

যামিনী রায়

বাঁকুড়া জেলার একটা অক্ষ্যাত গ্রাম বেলিয়াতোড়ে জন্ম হলেও যামিনী রায় তাঁর একান্ত সাধনায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্প হয়ে উঠেছিলেন। গ্রামে যাঁরা মাটির মূর্তি তৈরি করতেন তাঁদের কাছেই তাঁর হাতেখড়ি। তারপর গভর্মেন্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের পর ফাইন আর্ট বিভাগে ইউরোপীয় চিত্রকলা রীতিশিক্ষা শেখেন। গ্রামে জন্ম হওয়ার সুবাদে নিসর্গ প্রকৃতি, আদিবাসী জীবন, ধর্মকাহিনি নির্ভর ছবি, পটচিত্র ইত্যাদি সহজ স্বাভাবিকভাবেই চিত্রিত করেছেন। চিত্রকলায় তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব হলো — আর্ট স্কুলে গিলার্ডি সাহেবের কাছে তেল রঙে ছবি আঁকা শিখে পরে জল রঙে অসামান্য ছবি এঁকেছেন। পটচিত্রের উপর বিশেষ আকর্ষণ বশত তিনি মেদিনীপুর, বেলিয়াতোড়, কালীঘাট প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পট সংগ্রহ ও দীর্ঘ অনুশীলনের পর একটা নিজস্ব চিত্রশৈলী নির্মাণ করেন। ফরাসি চিত্রকলায় সরলরেখার পরিবর্তে বক্র রেখার যে ব্যবহার তাকে ব্যবহার করে ছবি আঁকেন। সেজান, ভ্যানগগ প্রমুখ শিল্পিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলার একটা নিজস্ব চিত্রকলা তৈরি করেছিলেন। তিনি চিত্রকলায় লোকাচার ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে গণেশ জননী, রাধা-কৃষ্ণ, যীশুখ্রিস্ট, সাঁওতাল মা ও দুই ছেলে ইত্যাদি ছবি এঁকেছেন। তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ভালোই হোক আর খারাপই হোক চিত্রকলার মধ্যে যেন একটা নিজস্বতা থাকে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

"প্রিয় ফুল খেলাবার দিন নয় অদ্য / ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা " — সমকালীন সংকটে কথাগুলি বলেছিলেন প্রবাদপ্রতীম এই কাব্য-কথার জনক হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা ছিলেন যামিনী দেবী। কলকাতার ৫০ নম্বর

নেবুতলা লেনের ভাড়াবাড়িতে তাঁর শৈশব কেটেছিল। কলকাতার বউবাজারে মেট্রোপলিটন স্কুলে তাঁকে ভরতি করা হয়। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ এবং ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে 'কবিতা ভবন' থেকে বিএ পাশ করেন। ব্যক্তিগতভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মার্কসবাদে বিশ্বাসী। সমর সেনের কাছে 'হ্যান্ডবুক অফ মার্কসিজম' পড়ে তিনি এই আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লেবার পার্টি ও পরে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'কথিকা' নামে একটি গদ্য। ১৯৩৩-৩৪ খ্রিষ্টাব্দে যখন তিনি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন সত্যভামা ইন্সটিটিউশনের স্কুল ম্যাগাজিন 'ফল্গু'-তে এটি প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'কবিতা ভবন' থেকে। 'পদাতিক'-এর জনপ্রিয়তার জন্য তিনি 'পদাতিকের কবি' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হলো— 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮) , 'চিত্রকূট' (১৯৫০), 'ফুল ফুটুক' (১৯৫৭), 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২), 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬), 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২), 'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯) ইত্যাদি। তিনি পাবলো নেরুদা, হাফিজ এবং নাজিম হিকমতের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাস— 'হাংরাস', 'কে কোথায় যায়', 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' ইত্যাদি। ভ্রমণকাহিনি 'আমার বাংলা' নামক প্রথম গদ্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে। এই ধরনের অন্য লেখা — 'যখন যেখানে', 'ডাক বাংলার ডাইরি', 'ভিয়েতনামে কিছুদিন', 'টো টো কোম্পানী' ইত্যাদি। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন'। ছোটোদের জন্য লিখেছিলেন—'ইয়াসিনের কলকাতা', 'দেশবিদেশের রূপকথা', 'জানো আর দ্যাখো জানোয়ার', 'এলাম আমি কোথা থেকে' ইত্যাদি।

সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে ছাত্রসমাজের ভূমিকা

ভারতীয় ঐতিহ্য হলো— বিবিধের মাঝে মিলন মহান। মিশ্র জাতির এই দেশে প্রাচীন কাল থেকে নিগ্রবটু, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গলয়েড জনগোষ্ঠীর বাস ছিল। পরবর্তীকালে আর্য, শক, হূণ, মোগল, পাঠান, ইংরেজ ইত্যাদি মানুষের আগমন ঘটেছে। ভারত মা তার কোলে সবাইকেই স্থান দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গোরা তার মা আনন্দময়ীর মধ্যে এই মিলনের মহান ঐতিহ্য অনুভব করতে পেরে সংকীর্ণতা থেকে আন্তর্জাতিক মানুষে উপনীত হতে পেরেছিল। অথচ যেসব সামাজিক সমস্যা মানবসভ্যতাকে আজও কলঙ্কিত করে, সাম্প্রদায়িকতা তার অন্যতম। মানুষের মধ্যে ভাষা, জাতি, ধর্ম প্রভৃতির ভিত্তিতে ভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ভিন্নতার ভিত্তিতে কখনোই একে অপরের শত্রু হয়ে ওঠা উচিত নয়। অথচ বাস্তবে সেরকমটাই ঘটতে দেখা যায়। এক সম্প্রদায়ের কাছে অন্য সম্প্রদায় হয়ে ওঠে বিদ্বেষ ও ঘৃণার পাত্র। একের প্রতি অপরের অবিশ্বাস, অবজ্ঞা আর অসহিষ্ণুতায় বিষিয়ে ওঠে পারস্পরিক সম্পর্ক। সাম্প্রদায়িক কলহ ও সংঘর্ষে দূষিত হয়ে ওঠে সমাজ তথা সমগ্র মানবসভ্যতা। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্প্রদায়িকতা এক ভয়ংকর

সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। এখনও এর অভিশাপ থেকে মানুষ মুক্তি পায়নি। বরং দিকে দিকে এই সমস্যা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করছে। কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে, কোথাও ভাষার ভিত্তিতে, কোথাও বা জাতি-পরিচয়কে কেন্দ্র করে সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ প্রকট হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার উগ্র মূর্তি প্রায়শই ঘনিয়ে তুলছে আশঙ্কার ছায়া। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে তো বটেই, অন্যান্য দিক থেকেও সাম্প্রদায়িকতার বিষে ভারতবর্ষ আজ জর্জরিত। কখনও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা, কখনও লড়াই বাধছে এক ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে আর এক ভাষাগোষ্ঠীর। সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করার দায়িত্ব দেশের প্রতিটি মানুষের। তবু এ বিষয়ে ছাত্র সম্প্রদায়ের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ছাত্রছাত্রীরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। সংঘবদ্ধভাবে তারাই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পৃথিবীর সমস্ত মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা জানিতেই পালন করা হয় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। বিশ্বের ইতিহাসে ২১ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, শফিউর , অহিউলাহ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। অনেক মানুষ আহত হন। মাতৃভাষার জন্য প্রাণদানের এই দৃষ্টান্ত সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে। মাতৃভাষাপ্রেমী শহিদদের এই প্রাণ বিসর্জন অবশ্য ব্যর্থ হয়নি। রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারির অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত মানুষের মধ্যে। তুমুল ভাষা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালে পূর্বপাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় বাংলা ভাষা। শেষ পর্যন্ত এই বাংলাভাষার উপর ভিত্তি করেই ১৯৭১ সালে জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের। মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন ও আত্মবলিদানের এই বিরল দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ইউনেস্কো-র পক্ষ থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা-দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর রাস্ট্র সংঘের বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির শহিদানের এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার যে উদ্যোগ নেয় তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য। ২০০০ সালে রাষ্ট্রসংঘ প্রথম এই দিনটি পালন করে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি মানুষের কাছেই নিজের মাতৃভাষা পরম সমাদরের বস্তু। মাতৃভাষাই আত্মপ্রকাশের যথার্থ মাধ্যম। মাতৃভাষার অপমান সহ্য করা আত্ম-অবমাননার নামান্তর। আপন ভাষার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব সকল দেশের সকল মানুষের। ২১ ফেব্রুয়ারির মতো একটি ঐতিহাসিক দিনকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার মধ্য দিয়ে প্রতিটি মানুষকে তার মাতৃভাষার প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলার একটি শুভ প্রচেষ্টা নিহিত আছে।